বারীন সাহা

চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—১

আজকাল সব বিষয়েই নন্দনতত্ত্বের ছাপ বা ছক বার করা হচ্ছে, অতএব সিনেমায় নন্দনতত্ত্বের সন্ধান বিচিত্র নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজে আমরা লাবণ্য অনুসরণ করে সংযোজনা করতে পারছি। সুদৃশ্য ছবি, সুন্দর নরনারী, নানা শব্দ ও রঙের বিচিত্র সমাবেশ, বিশেষ সুখকর সংলাপের মধ্যে লাবণ্য খুঁজে পাব না—একথা নিন্দুকের। কথা হচ্ছে, খুব বেশি করে পাচ্ছি, ও যা পাচ্ছি তা পরস্পর বিরোধী। আমরা সকলেই যেমন উপন্যাস পড়ে বলি লেখক সত্যি প্রথম শ্রেণীর লেখক, বা লেখক লিখতেই শেখেননি। কবিতা পড়ে বলি, কবির এ কবিতা কণ্ঠে তুলে নিলাম; বা এত দুর্বোধ্য, বাজে কবিতা ছাপা হয়েছে কেন? নাটক দেখে নাট্যকারের প্রশংসায় মুখর হই বা মুণ্ডপাত করি। অভিনেতার গুণ ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ হই; বা কেন এই অভিনেতাকে এ পার্ট দেওয়া হল তার কৈফিয়ত চাই। মোট কথা, আমাদের মতপ্রকাশ, নন্দনতাত্ত্বিক ভাল লাগা বা না লাগা বড়ই বিরোধী। মাপকাঠি এমন স্পষ্ট যে সকলে তা ব্যবহার করতে পারে ও বিষয়বস্তু এমন যার কালেরও পরিবর্তন হয় না। সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের বিচারে এমন কোনো স্পষ্ট মাপকাঠি আছে কিনা, ও বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকতে পারে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা এখানে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব এই প্রকার রস-বিচারের পরিমাপ সূত্র ও বিষয়বস্তুর মান নির্ণয় কীভাবে হতে পারে—বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। আমরা ধরে নিচ্ছি চলচ্চিত্র যদি রসগ্রাহ্য সৃষ্টি হয় তবে অন্যান্য রসগ্রাহ্য সৃষ্টির সঙ্গে তার স্বরূপগত মিল থাকবে।

প্রথমে সাহিত্যে রসসৃষ্টির বিচার আলোচনা করি। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের লেখা। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক তাঁরা মনে করতে পারবেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকেও অনেক সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্য-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রবীন্দ্র-কাব্যকে উপেক্ষা করতেন। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক পর্যায়ভুক্ত করা হয়। অতি আধুনিক যুগে রবীন্দ্র-কাব্যের সমাদর নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠেছে। আমরা বলতে পারি মাপকাঠিও বিষয়বস্তুর তিন যুগে বিভিন্ন, নয়তো এমন বিরোধী মত পেতাম না। প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞ সমালোচকরা শব্দবিন্যাস ও কৌশলের দিকে নজর দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই রবীন্দ্র-কাব্যে তাঁদের অভ্যন্তরূপ না পেয়ে তাঁরা কাব্যে তৃপ্তি পাননি।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের ভিন্ন ছক যেহেতু তাই তাঁদের মাপকাঠি ও বিষয় মান অনুযায়ী বিচার দ্বিতীয় যুগে অগ্রাহ্য হল। এখানে বাংলা ভাষার সংস্কৃতের বন্ধন থেকে মুক্তি ও তার স্বাধীন প্রকাশ বড় কথা হল এবং বিষয়বস্তুতে রোমান্টিক মনের প্রকাশ ও বিস্তার প্রাচীন সংস্কৃত অনুমোদিত বিষয় থেকে পৃথকীকৃত করল, মানও হল আলাদা। তৃতীয় যুগে এল বিদেশী আঙ্গিকের প্রভাবে রবীন্দ্র-আঙ্গিক অত্যন্ত সীমিত বলে ধারণা ও রবীন্দ্রকাব্যের মধুময় জীবন সম্বন্ধে বিষয়গত মতভেদ। এখানেও তাই মতের অমিলের কারণের আভাস পাওয়া যায়, সত্যাসত্য বিচার পরের কথা। সঙ্গীতের কথা ধরা যাক। প্রথম যুগে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত গান বলতে কালোয়াতিই বোঝাত। রোমান্টিক মনের স্থায়িত্ব এলে, তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ থেকে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শব্দগত, অর্থগত রোমান্টিক মনের সীমাহীন পরিধির বার্তার কথা স্পষ্ট হল। আবার এই রোমান্টিক মনে ফাটল ধরাতে দ্বিধা-বিভক্ত মন একবার ধ্রুপদী, একবার আধুনিক-বিকৃতির অনুসরণ করেছে। এখানেও মাপকাঠি ও বিষয়ের মানের কথা আসে। প্রথম যুগে সঙ্গীত ছিল শব্দের কৌশলী সঠিক প্রকাশ, মনের অন্তরতম কন্দরের লুকানো ভাবের, ব্যক্তিগত নয়, সার্বিক অরূপ-প্রকাশ। দ্বিতীয় যুগে এল বিষয়বস্তুর প্রাধান্য, ব্যক্তিগত গোপন ধন রহস্যের আবরণে অর্ধোন্মুক্ত করে দেখা দিল। মাপকাঠির ভিন্নতা হল কৌশল ও বিষয়বস্তুর নির্ণয়ে। তৃতীয় যুগে এই বিষয়বস্তু আরও বড় হয়েছে। আমরা বিচারের বিভিন্নতায় মাপকাঠির ও বিষয়বস্তুর তারতম্য দেখি।

এবার চলচ্চিত্রের বিষয় আলোচনায় আসি। এখানে কলাকৌশল যন্ত্র-সাহায্যে প্রকাশ পায় ও যন্ত্র ভাল হলে শব্দ ভাল হওয়া স্বাভাবিক ; উন্নত ক্যামেরা থাকলে ছবিতে নানা ভাব সংযোগও সম্ভব। অর্থাৎ সাহিত্যিকের শব্দ কৌশল, প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এখানে হল উন্নত যন্ত্রের সদ্ব্যবহার।

তাঁদের শিল্পকৌশল আয়ত্তের দৈহিক ব্যক্তিগত সাধনা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলা যায়। অর্থাৎ যন্ত্রের পরিধি সীমা ও কার্যক্ষমতা জানা থাকলে তার সদ্ব্যবহার যন্ত্রশাসন মাত্র।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এখানেও স্তরভেদ দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় চলমান চিত্র কেবল দর্শককে চমকিত-বিস্মিত করে মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রচলিত উপন্যাস, নাটক বা ঘটনাকে যথাযথ প্রকাশ করে সাধারণের মনোরঞ্জন করা হয়েছে। তৃতীয় অবস্থায় চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু উপন্যাস, নাটক ও যথাযথ ঘটনা প্রকাশ নয়, এমনকি দর্শকের মনোরঞ্জনও এর প্রথম কথা নয় এমনি একটা মনোভাব দেখা দেয়। যান্ত্রিক মান-নির্ণয় সোজা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রায় প্রতিবারই এই মুদ্রিত পৃষ্ঠার দৈর্ঘের মতোই স্থির।

গন্ডগোল বিষয়বস্তুর প্রকাশ নিয়ে। প্রথম স্তর আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। দ্বিতীয় স্তরে মাপকাঠি বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, অন্য বিষয় বা রসসৃষ্টি থেকে গৃহীত। এখানে

মাপকাঠির যন্ত্রগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হলেও বিষয়ের মাননির্ণয় ক্ষেত্রে অন্য-রস-গৃহীত মান অযৌক্তিক। তৃতীয় স্তর, নবীন মানের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ ছবির বিচার এখনও ঠিকমত হয়নি। যা হয়েছে, তা অন্য রস সৃষ্টির বিচার-মান-দ্বারা বিচার ; যে বিচার মূলত অগ্রাহ্য।

নতুন বিচার মানের কথা আলোচনা করি। প্রথমে আসে ক্যামেরার কথা। এই যন্ত্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট। এই সীমাকে স্বীকার করে যা কাজ হয় তাতে যদি প্রয়োজনীয় বস্তুর সীমিত প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় তবে ক্যামেরার কাজ পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। অর্থাৎ ক্যামেরাম্যানকে যা বলতে বলা হয়েছে ছবিতে যদি ক্যামেরার প্রকাশগণ্ডী মেনে নিয়ে তার স্বচ্ছ প্রকাশ পাই তবে ক্যামেরার কাজ সার্থক হয়েছে বলা যায় ; সূক্ষ্মভাবে এর মাপ সম্ভব। তারপর ধ্বনির কথা। এ বিষয়েও ওই এক কথা। এরপর আসে বিষয় নির্বাচন। অর্থাৎ কী ছবি তোলা হবে ও কেন ? এতদিন এ-বিষয়ে দ্বিমত ছিল না যে সিনেমাতে একটা গল্প থাকবে। অর্থাৎ সিনেমা, উপন্যাস, নাটক বা ঘটনার বন্ধন মেনে নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবে, হবে তাদের চিত্রগত প্রকাশ। শিল্প-কলায় এ বন্ধন নেই, সঙ্গীতে এ বন্ধন অগ্রাহ্য। সিনেমায় এ বন্ধন থাকবেই তার যুক্তি কী ? কথা ওঠে তবে সিনেমা কী প্রকাশ করবে, কী বলবে দর্শককে ? যা বলবে তা হয়ত পরিচালকের মনের কথা। অর্থাৎ সার্থক ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর মনের ছাপ দিয়ে অলক্ষ্যে এক বিশ্ব গড়ে তোলেন যা প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ-জাত হলেও পঙ্কজের মতো অমলিন, যার সান্নিধ্যে এসে ধূলি-ধূসরিত মলিন জীবন নতুন নির্মল জীবনের স্বপ্ন দেখে, পরিচালক এমন এক মহান জীবনের পাশে আমাদের পঙ্গু জীবনকে স্থাপিত করেন যা জীবনের পঙ্গুত্ব, হীনতা, নীচতা, অক্ষমতার সমস্ত আভরণ মুক্ত করে আমাদের মন-মুকুরের সামনে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করেন। এখানে বিষয়-মান হবে জীবন-বিচার। তা মেনে নিলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সত্য অর্ধসত্য ও মিথ্যা অনুযায়ী এর বিচার আলাদা হবে।

এই আলোচনায় যে মাপকাঠির আভাস পাচ্ছি তা এই : সিনেমার প্রকাশ রীতি যান্ত্রিক। এখানে অর্থ, কৌশল, উন্নত যন্ত্রই মান নির্ণয় করবে এবং এ মান প্রতিটি অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে আজও যেমন কালও তেমন। বিষয়বস্তুর মান সম্বন্ধে দেখা গেল সিনেমায় চিত্র বা সঙ্গীতের মতো বিষয় হয়ত অবান্তর, বা সামান্য লক্ষণমাত্র। আমাদের বর্তমান বিচারে এই গল্পাংশ ও তার প্রকাশই বড় কথা হয়েছে ও সিনেমার এ রূপ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও তার সম্ভাবনার মাত্র ক্ষুদ্র অংশজাত। এখন নতুন রূপ স্পষ্ট নয়, কাজেই বিচার চলছে অন্য সৃষ্টির রীতি অনুযায়ী যা যুক্তিগতভাবে অগ্রাহ্য। ফলত এখনও সিনেমার প্রকৃত জন্ম হয়নি, বিচার বিচাররূপে অপ্রয়োজনীয়, নবতর সম্ভাবনার সূচক হিসাবই এসব ব্যক্তিগত বিচারের প্রয়োজনীয়তা। □

রচনাকাল : ১৯৬৩

১৯৬৩ সালে 'দর্শক' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বারীন সাহা ফিল্মের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কোথাও এক লাইনও লেখেননি। শুধু তাই নয় উনি এটা মেনে নিয়েছেন 'আমি লিখতে পারি না।' তবু আমরা তাঁকে লেখার অনুরোধ করি। বারীন বললেন, 'এসো আড্ডা মারা যাক।' অর্থাৎ আমরা আলোচনা শুরু করলাম। চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—২ সেই আলোচনা থেকে ছেঁকে তোলা।

—সম্পাদক

চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—২

১ : নানা মুনির নানা মত

আর্ট, আর্টিজান ছাড়া হয় না, কিন্তু সব আর্টিজান আর্টিস্ট নয়। ব্যতিক্রম আছেই। একটি পর্যায়ে গেলে আর্টিস্ট হওয়া যায়— যদিও এর নির্দিষ্ট কোনো নিরিখ নেই। আদিম শিল্পে যেমন দেখা গেল কলসী তৈরি করা হচ্ছে— সবই একরকমের। একটা একটু অন্যরকম। তখন খোঁজটাই হল— কেন এটা অন্যরকম। এখানেই প্রকাশের প্রশ্নটি এসে যায়। কেউ হয়ত চেয়েছিলেন কিছু একটা প্রকাশ করতে। তার সঙ্গে সাধারণ কারিগরির পার্থক্য দেখা গেল। তবে, কারিগরি না থাকলে হবে না। ক্রাফট্‌সম্যানশিপ। একজন ভাল লেখকের ক্ষেত্রেও তার কথার একটা ক্রাফট্‌সম্যানশিপ, কারুকাজ থাকা উচিত। কিছুদিন আগে নাইপলের লেখা পড়ে এই কারিগরির আভাস পেলাম। ওঁর সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য : 'হি হ্যাজ নেভার রিটেন এ ব্যাড সেনটেন্স'। অবশ্য, শুধু তাতেই যে তিনি একজন মহান লেখক হয়ে যাবেন সেকথা বলা যায় না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেছেন তিনি কিন্তু একটিও সদর্থক কথা বলেননি। যার জন্যে আমি ওঁকে নিহিলিস্ট বলে থাকি।

ইওরোপের ফিল্ম-প্রশিক্ষণে একদিকে যেমন ফিল্ম-এর ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি পড়ানো হয়, তার সঙ্গে কারিগরি বিদ্যাও শেখানো হয়।

ইওরোপে ফিল্ম-এর ক্লাসে পুরনোদিনের নানান ছবি দেখানো হত, যেগুলো ফিল্মের ইতিহাসে 'ল্যান্ডমার্ক' হিসাবে চিহ্নিত। এই ছবিগুলো ওদেরই— ওরাই করেছে ছবিগুলো— ওরাই 'ল্যান্ডমার্ক' বলছে। আগে ওরা আবিষ্কার করেছে, আমরা পরে নিয়েছি। ক্রিকেটের মতো। আমরা যারা বিদেশের ছাত্রছাত্রী ছিলাম, আমাদের কাছে — কখন কী অবস্থাতে একটা ছবিকে 'ল্যান্ডমার্ক' বলা হচ্ছে— তা পরিষ্কার ছিল না। বছরে হয়তো দেড়শো / দু-শো ছবি দেখলাম, সেগুলো সম্পর্কে প্রফেসরদের বক্তব্যটাই শুনতাম, নিজেদের কোনো ক্রিটিকাল ফ্যাকাল্টি গড়ে ওঠেনি। আর তখনকার

দিনের খারাপ ছবিগুলোও দেখিনি। যখন সাম্প্রতিক কালে চলে আসি আর তার সঙ্গে পুরনো দর্শনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি তখন ছবিটা অন্যরকম হয়ে যায় নিজের কাছে। অনেক তফাত হয়ে যায়। আমার নন্দনতত্ত্ব আর আরেকজনের নন্দনতত্ত্ব যে একরকমই তার কোনো মানে নেই। ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করার অর্থ শুধু ফিল্মের কারিগরি নিয়ে আলোচনা নয়। ধরা যাক আমি একটা সোস্যাল স্যাটায়ার করলাম কি সমাজের একটা চিত্র তুলে ধরলাম, দেখতে হবে চিত্রটা কী হওয়া উচিত, কোথায় তার উড়ান বা উল্লম্ফন (ডিপারচার) হয়েছে, কোথায় মনগড়া হয়েছে ইত্যাদি। এবারে দর্শনের প্রশ্নও আছে,— বাহ্য, বহির্বস্তু আর অন্তর্বস্তুর বিচার। যেটা আমি দেখছি সেটা করছি— আমার দেখাটা আত্মগত (সাবজেকটিভ)। আর একজন যদি অন্যরকম ভাবে দেখে তাহলে সে আমায় 'সাবজেকটিভ' বলবে না। ইংরেজিতে বলে 'পীয়ার অ্যান্ড পল' থিওরি। একটা রঙ দেখে পীয়ার ও পল দুজনেই বলল, 'হলদে'। তাহলে দুজনকেই 'অবজেকটিভ' বলব। কিন্তু একজন 'হলদে' আর একজন 'লাল' বললে দুজনকে 'সাবজেকটিভ' বলব। আসলে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতা বলে কোনো জিনিস নেই। আমি কীরকমভাবে দেখছি, সেটা যদি আর পাঁচজনকে দেখাতে পারি তাহলেই আমি সফল। কিন্তু সেটা নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে কতখানি ওতরাচ্ছে? হঠাৎ একটা জিনিসকে বললাম 'মাস্টারপিস্'। পাঁচটা ছবিকে 'ভাল' বলছি— আর একটাকে 'মাস্টারপিস'। কেন? মাস্টারপিস আর কিছুই নয়— একটা পারটিকুলার সময়ে যে সমস্ত চেষ্টা হচ্ছিল, কোনো একটায় তার সবকটা শৈল্পিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল— সেটাই মাস্টারপিস। গুয়ের্নিকা যেমন, অনেকদিন ধরে, অনেক রকমের চেষ্টা হতে হতে নতুন দিশার এক উন্মোচন (ব্রেক-থ্রু)। একটা আবিষ্কার— যা পরে একজন কেউ করলে তা আর আবিষ্কার থাকে না।

নন্দনতত্ত্বের বিচারও অনেকরকম হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস দেখার পর আমার 'ভাল লেগেছে' বা 'খারাপ লেগেছে'— এটাই চূড়ান্ত কথা। ওই অস্তিত্ববাদীরা যেমন ধরে নেয়— 'আই অ্যাম দি সেন্টার অব দি ওয়ার্ল্ড।' বিশ্বের কেন্দ্রে কেবল আমিই।

২ : এক তরকারি নুনে পোড়া!

আর একটা জিনিস হল— যা দেখেছি সেটাকে পর্দায় নিয়ে আসা— এ এক বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ। ইওরোপেই আমি এই প্রশিক্ষণ লাভ করি। এ কেবল যন্ত্রকুশলতা অর্জন নয়। এর মধ্যে নানা রকমের নান্দনিক শিক্ষাও ছিল। অর্থাৎ ফোটোগ্রাফি হোক, ফিল্ম-ফটোগ্রাফি হোক, অথবা গল্প বলার মধ্যেই হোক, বা টোটাল ফিল্ম-এর স্ট্রাকচার-এর মধ্যে দিয়েই হোক— যা দেখছি সেটা তুলতে পারাটাই আসল কথা।

ইওরোপে ফিল্ম-স্কুলে পড়ার সময় ওখানকার মাস্টাররা ফিল্মের শুদ্ধতা নিয়ে অনেক জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। রোজই বক্তৃতায় শুনতাম—এটার মধ্যে খানিকটা থিয়েটার আছে, ওটার অভিনয় ভাল—এইসব। এই শুদ্ধতার বিষয়টি আমার ছবি 'তেরো নদীর পারে'তে আছে। মানে ছবিটির গল্পের মধ্যে।

বাইরে থেকে দেখলে গল্পটা হল—একটা সার্কাস চলছিল। কিন্তু তা দেখে কেউ আমোদ পাচ্ছিল না। কারণ সেখানে কখনও জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখানো হয়, আবার যখন জন্তু-জানোয়ার নেই তখন শুধুই অ্যাক্রোবেটিকস দেখানো হয়—বিভিন্ন সব খেলা দেখানো হয়। ঊনিশ পয়সার টিকিট, গায়ে লাগে না, লোকে তাই এসে দেখছিল। তা একটি মেয়ে সস্তায় পাওয়া গেল। হাতি কি বাঘ অত সস্তায় পাওয়া যায় না। এখন যে ক্লাউন ছিল, যে এমনি করেই এখানে সারা জীবনটা কাটিয়েছে হঠাৎ তার একটা সংকট আরম্ভ হল—'তাহলে তো আমার কোনো দাম নেই, মেয়েছেলেটাই পয়সা পেতে পারে।' এই ছিল গল্প। আমার কাছে গল্পটা হল—যে যত গরিব দেশ আমরা দেখি, সেখানে তারা নানারকম পদ রান্না করে না। একটাই এমন পদ রান্না করে যার মধ্যে সব থাকে। যদি একটা তরকারি খেল তো তার মধ্যে একটু মাংস দিয়ে দিল। একটু মশলা বা তেল দিল, এটা ওটা দিয়ে একটাই প্লেট তৈরি করল। আমাদের দেশে যেমন খিচুড়ি কিংবা ঘ্যাঁট রান্না হয়। আমাদের দেশের আমোদ বা বিনোদনের অবস্থাও এরকম। এখানে যেই আপনি খুব বিশেষে (স্পেসিফিকেশনে যাচ্ছেন, ধরুন শুধু সার্কাস করছেন, হবে না। আমাদের যাত্রা যেমন অপেরা আর নাটকীয়তা দুটোই মেশানো। আর যাত্রার থিয়েটার-পার্টটা মেলোড্রামাটিক—তাতে প্রচুর চিৎকার করা হয়। দর্শক দূরে থাকে বলে চওড়া মেক-আপ দিতে হয় যাতে আলো ফেললে অনেক দূর থেকে বোঝা যায়। সূক্ষ্ম জিনিসটা বাদ দিতে হয় যাত্রার মধ্যে। এই সমস্যাটা সব জায়গাতেই আছে। দিস ওয়াজ দি প্রবলেম ডেলট্ ইন মাই ফিল্ম। আমার ছবি 'তেরো নদীর পারে'র বিষয় বা থিম বলতে এটাই। এই সমস্যাটিকেই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, বিশুদ্ধ শিল্পের আঙ্গিক চলে না।

স্থূল আর সূক্ষ্মের এই দ্বন্দ্ব—ছবি করার সময়ে এই বিষয়টাকে আমার দেশের সমস্যা হিসাবেই আমি ভেবেছি। পরে এটা আমার সমস্যা হয়ে গেল। অর্থাৎ বিষয়টা তখন হয়ে গেল স্থূল-সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের মাঝখানে একজন ফিল্ম-মেকার হিসাবে আমার সমস্যা।

৩. ইমেজ+সাউণ্ড নাকি ইমেজ এবং সাউণ্ড

নামটা ভুল হতে পারে সম্ভবত আর্লহাইন ১৯৩২ (?) সালে বলেছিলেন 'টকি'র যথার্থতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি ইমেজ আর সাউন্ড-ট্রাক দুটো আলাদা স্তরে (ডিফারেন্ট প্লেনে) ব্যবহার করা যায়। প্রথমে উনি টকির বিরুদ্ধে ছিলেন। পরে মত পাল্টে বলেন যে একমাত্র দুটো ডিফারেন্ট প্লেন-এ গেলেই টকি শিল্পের পর্যায়ে যেতে পারে। মুখের ভাষায় যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তার জন্য একটা আলাদা স্তর (ওর‍্যাল প্লেন) থাকবে ;

যেটা সাউন্ড-ট্র্যাক এর মধ্যে থাকছে। সেটা মিউজিক হতে পারে বা কথাও হতে পারে। সাধারণত বাংলা সিনেমায় যা দেখি তাতে সাউন্ড আর ইমেজ-এর মধ্যে একটা সাপ্লিমেন্টারি আর আরেকটা কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে রোল প্লে করে। অর্থাৎ কোনো জায়গায় মনে হল যে ইমেজটা ডেফিসিয়েন্ট—তাতে অ্যামবিগুইটি আছে—সেই অ্যামবিগুইটিকে মারতে সাউন্ড ব্যবহার করা হল, একটা মিউজিক বা ডায়লগ দেওয়া হল। এইভাবে একটা জিনিসের উপর জোর দেওয়া হল। একে সাপ্লিমেন্টারিও বলা যায় বা কমপ্লিমেন্টারিও বলা যেতে পারে। এ ধরনের জিনিসই প্রচুর। আর একটা হল ইনসিডেন্টাল ব্যবহার, একজন পেয়ালাটা রাখল তার আওয়াজ হল। তাতে একটা সাউন্ড দিতে হল।

আমার ঘরে বসে কেউ কথা বলছেন, সেখানে গ্যালিলিয়ান সায়েন্সের মতো সাউন্ড এর ব্যবহারকে জাসটিফাই করতে হবে—অন্য জায়গার সাউন্ড এখানে আসতে পারে না—বাহ্যত ব্যবহারটা এভাবেই হয়ে থাকে। ফিল্মকে জাস্টিফাই করতে গেলে সাউন্ড এবং ইমেজ একই সঙ্গে রয়েছে—এটা হতে বাধ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাউন্ড-ট্র্যাকটা সব সময় 'কনডেমড উইথ দি ইমেজ' হবে। সমস্ত সাউন্ড-ট্র্যাকই ইমেজের তলায় চাপা পড়ে যাবে এমন কিন্তু নয়।

এখানে আলহাইনের কথাটা আসছে। উনি চাইলেন একই জিনিসকে অন্য স্তর থেকে ধরতে। এটা একেবারেই উপলব্ধির ব্যাপার। এমনিতে বোঝা শক্ত তবে ছবি দেখলে বোঝাটা খুবই সোজা হয়ে যায়। রগিয়ে বা রেনের ছবিতে এর ব্যবহার আছে। 'হিরোশিমা মন আমর' বা 'মারিয়েন বাগ' এ দেখা যাবে কোনো কোনো জায়গায় কমেন্ট্রিতে চলে যাচ্ছে, কোথাও একটা সাউন্ড ভেসে আসছে—এই জায়গাটা খুবই মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক।

সাধারণভাবে, ইমেজটাই সাউন্ড-ট্র্যাক নির্ধারণ করে দেয়। গ্রাউন্ড রিয়্যালিটির ব্যাপার আছে। একটা লরি চলে গেল—তার সাউন্ড তো দিতেই হবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি সেখান থেকে বের হতেই না পারি, দরকার হলে লরির আওয়াজকে চাপা দিয়ে একটা মিউজিক বা একটা ডায়লগ যদি সেখান থেকে না বের করি, তাহলে আর শিল্প হচ্ছে কোথায়?

আমাদের বাংলাদেশের প্রগ্রেসিভ ফিল্ম-মেকাররা ইমেজের ওপরেই জোর দিয়ে যাচ্ছেন। ওই সাপ্লিমেন্টারি ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নেই, এমনকি সত্যজিৎবাবুও তাই। প্রথানুগ বলুন, বা স্বাভাবিক এই ধরনের ব্যবহারকে আমি ঠিক নিন্দে করছি না, তবে আমি নিজে ছবি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বুঝে একে বাদ দেব।

৪. গল্পের লজেঞ্চুস

ফিল্মে গল্প একটা থাকেই। আপনি না বললেও লোকে একটা গল্প ঠিক বের করে

নেবে। একটা কনটেন্ট আছে বলে ধরে নেবে। আপনার কিস্যু করার নেই। যদি আমাকে 'শূন্য' (০) নিয়ে ছবি করতে বলা হয়, তাতেও একটা সাবজেক্ট, একটা কনটেন্ট আছে। এখন ছবিটা কীভাবে করব সেটা আলাদা ব্যাপার। আমাকে হয়ত লীলাবতীর কাছে গিয়ে জেনে আসতে হবে! সুতরাং তর্কের খাতিরে কনটেন্ট একটা আছে বলেই ধরে নিতে হবে। গল্প বা একটা প্লট সব ছবিরই আছে। কিন্তু প্লটটা আপনি কীরকম ভাবে বলছেন, সেইটাই বড়। ডায়লগ, মিউজিক, ফোটোগ্রাফি সব কিছু মিলিয়ে কীভাবে বলছেন গল্পটা—এতেই গোটা জিনিসটা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ওইরকম : আমাকে প্রথমে ভাবতে হয় যে কীসের ওপর ছবি করব। তারপর আস্তে আস্তে ছবিটা গড়ে তুলব। স্ক্রিপ্ট লিখতে পারি, নাও লিখতে পারি। শুধুই চিন্তা করতে পারি। করতে করতে এমন একটা জায়গায় যাই যখন কনটেন্ট বলে আর কিছুই থাকে না। কী রকমভাবে বলছি সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এই জিনিসটাই আঙ্গিক। কনটেন্ট বা বিষয় এখানে আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই বলে তর্কের খাতিরে কনটেন্টকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্ভব নয়। কনটেন্ট থাকলেও তার একটা পয়েন্ট অফ ডিপারচার থাকবে। কনটেন্ট আর্ট নয়, কীভাবে বলা হল—সেটাই আর্ট।

সঙ্গীতে যেমন কনটেন্ট বলে কিছু নেই—তেমনই মনে হয় সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই একটা পর্যায়ে সাধারণ ভাবে কনটেন্ট হিসাবে আসলে কিছু থাকে না। আমাকে একজন বললেন, 'সার্কাস নিয়ে কেরালায় একটা ছবি হয়েছে।' আমি বললাম 'যাঁরা সার্কাস নিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা দেখুন, আমার চিন্তা ফিল্ম নিয়ে।'

আলোচনা করতে গিয়ে কখনো বলছি কনটেন্ট আছে, কখনো বলছি নেই—এই একটা বিরোধ থেকে যাচ্ছে। আসলে আমাদের ভাষাতেই এই বিরোধ সব সময় আছে। যা ভাবি তা সবসময় বলে উঠতে পারি না, যিনি পারেন—নিঃসন্দেহে তিনি একজন মহান শিল্পী। সবকথা বোঝাতে পারলে আমি খুব বড় দার্শনিক হয়ে যেতাম!

গল্পের কথায় ফিরে আসি। আপনি যখন কোনো গল্প বলেন, গল্পটা কিন্তু পাল্টে যায়। আমার এক অ্যামেরিকান বন্ধুর ডাইরি লেখার অভ্যাস ছিল। আমি সেটা জানতাম না। একবার ৫২-৫৪ সালে ওদের ওখানে গিয়েছি ; পরে আবার ৬৬ সালে গিয়েছি। অনেক রকমের গল্প করতাম, মজার-মজার সব গল্প। ও আমায় বলল, 'তোমার গল্পের মূল জিনিসটা ঠিক থাকে কিন্তু বলতে গিয়ে প্রতিবারই তুমি নতুন কিছু জিনিস যোগ কর আর পুরনো কিছু বাদ দাও। ডাইরিটা দেখিয়ে বলল, 'এই গল্প তুমি আগেও করেছ।' আমি ঘটনার বর্ণনা করছি, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নিজের কথাও চলে যাচ্ছে —এটা হয়।

আন্তোনিওনি সম্পর্কে এক ক্রিটিকের বক্তব্য ছিল যে সব ছবিতে উনি একই কথা বলেছেন। বেশিরভাগ বড় ফিল্ম মেকার একই কথা বলেন বিভিন্ন রকম ভাবে। আমার তো একটাই ছবি। তাই, হাঃ, নিজের বিরুদ্ধে যে যাব, অন্যরকমভাবে বলব, তার কোনো

সুযোগই পেলাম না!

ফিল্ম প্রেজেন্ট টেনস্-এ কথা বলে। এটাই ফিল্মের ধর্ম, সবসময় আপনাকে প্রেজেন্ট টেন্সে বলতে হবে। এর মধ্যে ফ্ল্যাশ-ব্যাক থাকলে তা পাস্ট টেন্সে বলা যায়। তবে তার জন্য দর্শককে প্রস্তুত করতে হয়, বুঝিয়ে বলতে হয় এতক্ষণ প্রেজেন্ট টেন্সে ছিলাম, এবার অতীতে যাচ্ছি, এর জন্য কতগুলো টেকনিক আছে।

ফিল্মে লোকে যা পর্দায় দেখে সেটাকেই বাস্তব হিসাবে ধরে। বস্তুত তা বাস্তব নাও হতে পারে কিন্তু তা বাস্তব হিসাবেই গৃহীত হয়। এমনকি পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। পর্দায় তাকে বাস্তবই হতে হবে। আমরা জানি জিনিসটা বাস্তব নয়, কিন্তু ছবি যখন দেখানো হয় তখন সেটা বাস্তব হিসাবেই ধরা হয়। আঁদ্রে বাজ্যাঁ বলেছিলেন 'পুভওয়ার ইর‍্যাশিওনেল দ্য সিনেমা' (ইর‍্যাশনাল পাওয়ার অফ সিনেমা)। এই বাস্তব জিনিসটা তো সে অর্থে যৌক্তিক নয়। ছবিতে সবকিছুই বাস্তব হওয়া চাই। আমি স্টুডিয়োতে সাজিয়ে গুজিয়ে যা তুলছি সে সব বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। সেইজন্য ফিল্ম এর কারিগরিতে বাস্তবের ছাপ রাখতে হবে। ছবি করার সময়ে আমার মনে হয়েছিল টালিগঞ্জ আমাকে সেটা দিতে পারবে না, লোকেশন পারবে। কেননা তা বাস্তব, সেটা বাস্তবে আছে—ওই রবি বা বংশীকে ধরে ভাঙা দেওয়াল তৈরি করতে হচ্ছে না।

এই ব্যাপারটা একসময় থিয়েটারে (প্রসেনিয়াম) ছিল। প্রসেনিয়াম মানে ব্রিটিশদের কাছ থেকে নেওয়া আমাদের ওই পুরনো থিয়েটার—তাতে বাস্তবের সঙ্গে একটা যোগ ছিল। তারপর যখন ফিল্ম এল, তখন প্রসেনিয়ামের 'রেজঁ দেত্র্'—অর্থাৎ 'রিজন্ অফ বিইং'-এর অর্থাৎ অস্তিত্বেরই আর কোনো মানে রইল না। প্রসেনিয়ামে যা করা হচ্ছিল, ফিল্মে তা আরও ভাল করা যায়। তখন থেকে থিয়েটারও অন্য ফর্ম খুঁজতে আরম্ভ করল। খুঁজতে-খুঁজতে আজ থার্ড থিয়েটার, এরেনা থিয়েটারে এসেছে। এরেনা থিয়েটার ব্রিটিশ থিয়েটার নয়, শুরুতে এটা গ্রীকরা করত। প্রসেনিয়ামের বাক্সের মধ্যে নয়। ধরা যাক, একটা সিগারেট দেবার দৃশ্য। আমি এমন ভাবে প্যান্টো-মাইম করে সিগারেটটা দিলাম আর আপনি নিলেন—সিগারেটটা সিগারেটই হল। সিগারেটের প্যাকেটটা আজকের থিয়েটারে দেখাবার প্রয়োজন নেই। ফিল্ম-এ তা হবে না। 'পিরিয়ড-গল্প' হলে আপনাকে সেইরকম প্যাকেট যোগাড় করতে হবে—সেই রিয়্যালিটি দেখাতে হবে—চূড়ান্ত নিখুঁত ভাবে। তাহলে ফিল্ম এর একটা ধর্ম পাচ্ছি—ফিল্মের ফোটোগ্রাফ বাস্তব হিসাবে গৃহীত হয়।

৫. মাধ্যমের ধর্ম, সীমা

প্রতিটি মাধ্যমেরই 'স্পেসিফিক কোয়ালিটি' বলে একটা জিনিস আছে। অর্থাৎ যে জিনিসটা করা হবে, দেখতে হবে সেটা অন্য কোনো মাধ্যমে করা যায় কি না। উদাহরণ দিয়ে বলি। বিভিন্ন অবস্থায় আমরা নিজেদের ভারতীয় বলি অথবা বাঙালি

বলি। তাহলে এই 'বাঙালি'টা কী? এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। বাংলাদেশ রেডিয়োতে একটা বিতর্ক শুনেছিলাম, তাতে অনেকের বক্তৃতার পর আনিসুজ্জামান নামে একজন বক্তব্য রাখেন। উনি ইতিহাস আর বাংলা ভাষা চর্চায় নামকরা লোক। পুরনো বাংলা থেকে রূপান্তর করে আধুনিক বাংলায় উনি একটা কবিতা শোনালেন। তাতে ছিল — শাকান্ন— শাক আর অন্ন; গব্যঘৃত, মৌরলা মাছ, স্ত্রী স্বামীকে খাওয়াচ্ছে, হাতে একটা পাখা— এই হচ্ছে বাঙালি। এই এলিমেন্টারি জিনিসগুলো ধরে উনি বাঙালির স্পেসিফিক কোয়ালিটির সন্ধান করেছেন।

স্পেসিফিক কোয়ালিটির বিচার করলে দেখতে হবে আপনি যা ফিল্ম-এ করবেন তা অন্য মাধ্যমে করা যায় কি না। কিন্তু অত বাছবিচার করা সম্ভব হয় না। কাজের মধ্যে অন্য মিডিয়ামের জিনিস চলে আসে।

ফিল্ম-এর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে থিয়েটার [প্রসেনিয়াম] বিবর্তিত হয়ে আজকের থার্ড থিয়েটারে এসেছে সে কথা আগেই বলেছি। থার্ড থিয়েটারে প্রপ-এর দরকার হয় না, পোশাকেও কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। অভিনেতাদের ভিতর থেকে জিনিসটা বের করে আনা হয়। একটা মাধ্যম যদি জোরের সঙ্গে কোনো কাজ করতে থাকে, তার প্রভাব অন্য মাধ্যমগুলোতেও পড়তে বাধ্য, তখন অন্য মাধ্যমগুলোও পাল্টে যেতে থাকে। যেমন ফোটোগ্রাফির আবিষ্কারের পর পেন্টিং অনেক পাল্টে গেল। একটা সময়ে আপনার আঁকা কাটা আপেলের ছবিতে ভুল করে মাছি বসেছে—এটাই ছিল তখন চিত্রের উৎকর্ষের নিরিখ। কিন্তু ফোটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল, ফোটোগ্রাফিতে যা করা যাচ্ছে, পেন্টিং আর তা পারবে না। তখন পেন্টিং নিজের সত্তা খুঁজতে আরম্ভ করল। এই সত্তা তার ছিলই। কিন্তু এখন তার উপর কেন্দ্রীভূত হল সমস্ত আলো।

ছবিতে বাহ্য বাস্তব তুলে তুলে আনার মূল সূত্রটা কী। যদি আমাকে ক্ষুধার্ত মানুষ দেখাতে হয় খিদে ব্যাপারটা মুখে লেখা থাকা উচিত। যতই ডাস্টবিন বা এটা-ওটা দেখাই না কেন। এখানে ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক হতে পারে। আমি ঠিকমতো নাও দেখাতে পারি। অথবা দর্শকের মনে হয়ত দাগ কাটা গেল না। অর্থাৎ হয় আমি ব্যর্থ হয়েছি নয় তো দর্শক।

বাস্তবে যা নেই তা দেখাতে না পারাটা পরিচালকের সীমাবদ্ধতা। আর ফর্ম-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি মিডিয়ারই নিজস্ব কিছু বাধা থাকে। কাঠের কাজ করলে একরকম, পাথর এক-রকম বা মেটাল আর একরকম। ম্যাটার-এর এই রেজিস্ট্যান্স সমস্ত আর্ট ফর্ম-এর ক্ষেত্রেই একটা সমস্যা। ফিল্ম-এর রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি। আমাকে একটা ইউনিট নিয়ে কাজ করতে হবে। কোথাও না কোথাও কেউ হয়ত 'ফেল' করল। হয়ত একজন অভিনেতাকে নির্বাচন ঠিক হয়নি, বা ঠিক হলেও লাইটিং হয়ত ঠিক হয়নি — সেক্ষেত্রে দেখা গেল মুখে ক্ষুধার আঁচড় ফুটে উঠল না।

৬. আত্মজৈবনিক প্রলাপ

আত্মজৈবনিক উপাদান মিশে থাকলে ছবি ভাল হবে। সে জন্য আমার 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ভাল লাগে। দেশের সমস্যার সঙ্গে ওখানে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্টস মিশে আছে। ঋত্বিক অনেক নিজের কথা বলেছেন। এই প্রথম দেখা গেল উনি বিষ্ণু-বাবুদের আওতা ছেড়ে বেরিয়েছেন। 'কোমল গান্ধার' দেখে মনে হয়েছিল— উনি বিষ্ণুবাবুতে (কবি বিষ্ণু দে) একেবারে মজে আছেন। বিষ্ণুবাবু যেমন গ্রীক পুরাণ নিয়ে কবিতার মধ্যে ঢোকেন 'কোমল-গান্ধার'-এ ঋত্বিকও তাই করেছিলেন। মায়ের ডাইরিটা হচ্ছে বাংলার ইতিহাস, 'আর্কিটাইপ থিওরি' এই সব ছবিতে ঢোকানো ছিল। 'মা'-এর ব্যাপারটা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে একেবারে না গেলেও কম আছে। এ ছাড়া নিজের মদ খাওয়া নিয়ে বক্রোক্তি— এইসব ছেলেমানুষি কিছু আছে।

গ্রেট আর্ট হতে গেলে তার মধ্যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থাকতেই হবে এমন ধরনের কমেন্ট করতে আমি রাজি নই। তবে অথেনটিসিটি অব আর্ট-এর প্রশ্নে, মনে হয় অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থাকা দরকার। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহ ঠিক কী স্তরে কাজ করে চলে আমরা তো সবসময় জানি না। যখনই অবাধে কাজ করতে পারি তখনই তা প্রকাশ পায়। যেমন নিজের কথা অবচেতন স্তর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সেটা কখন বের হচ্ছে তা সব সময় বোঝা মুশকিল হয়। আমি যখন ছবিটা করেছি তখন, আমার অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট ছবিতে থাকবে— মনে হয় না এরকম বুঝে করেছি। তখন মনে হয়নি।

ছোটবেলা থেকেই সার্কাস ভাল লাগত। বাবা, শুধু চার্লি চ্যাপলিন আর সার্কাস আমায় দেখতে দিতেন— আর কিছু নয়। কনজার্ভেটিভ ফ্যামিলি। ঠাকুরদা কনজার্ভেটিভ ছিলেন। বাবা কিছু বলতেন না, বলতেন 'আমার সঙ্গে যাবি।' বাবা ও অন্যান্যদের একটা আড্ডা ছিল কলেজ স্ট্রিটের ওপরে। মাঝে মাঝে বাবা নিয়ে যেতেন, বেরিয়ে কচুরি খাওয়াতেন। কখনো কখনো এলফিনস্টোন হলে চার্লি চ্যাপলিন আর শীতকাল এলেই সার্কাস। হিউম্যান ক্যানন-বল। সেটা ছোটবেলার একটা ভাললাগা ছিল।

এই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট সম্পর্কে এখন আমি মাঝে মাঝে ভাবি। ছবিতে কেন এটা হল, কেন ওটা হল, এসব ভাবনা আসে। আমার সেই সময়ের বন্ধুবান্ধব মদটদ খেলে যারা সন্ধেবেলা অনেক কথা বলত, কথাগুলো আমার মনে ছিল। আমার ধারণা মদ খেয়ে বা সঙ্গমের পর আমরা যখন খুব ঢিলেঢালা হই তখন অনেক সত্যি কথা বলি। বিভিন্ন সিকোয়েন্সে সে সমস্ত কথা আমি প্রচুর প্রয়োগ করেছি। আমার এক বন্ধু ছিল দিলীপ – পোস্টাফিসে কাজ করত। অ্যালকহলিক। প্রচুর মদ খেয়ে বলত, 'আমার কথা কী বুঝবি? সারাজীবন তোকে যদি ফরেন মেল সর্ট করে যেতে

হয় ·· বাঙোৎদের মেল সর্ট করি আর বস্ পিছনে দাঁড়িয়ে দেখে ঘোষবাবু ঠিক সর্ট করছে কি না···।' ইওরোপেও প্রচুর লোকের সাথে দেখা হয়েছে—কথা হয়েছে—যা হয়ত অবচেতনভাবেই আবার ফিল্মে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের অস্তিত্বের একটি স্তরে, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে টাকা জিনিসটা কিন্তু নয়। সেখানে আমার সত্তাই সব। আপনি হয়ত একটি ছবি এঁকেছেন, ছবিটায় কত টাকা পেলেন সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সবাই আসছে, ছবিটা দেখছে, বোঝবার চেষ্টা করছে এর একটা তৃপ্তি আছে। আমি অবশ্য এটা করবার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। খেদ হয়ত থেকে যাচ্ছে—তা আমরা তো প্রত্যেকেই কোনো না কোনো খেদ নিয়ে বেঁচে থাকি। অনেকে যেমন কোনো ভয় নিয়ে বাঁচে, কোনো কনসার্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। এটা টাকাকড়ির কোনো ব্যাপার নয়। আন্তোনিওনি থেকে উদাহরণ দিই। 'মনিকা ভিত্তি'তে যেমন দেখিয়েছেন যে বিরাট ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট-এর বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, কোনোই অর্থচিন্তা নেই— সে হঠাৎ মনে করছে—জীবনটা ফাঁপা, শূন্য। এ একটা মানবিক সমস্যা। ও বলছে 'হোয়েন ইউ আর শ্রাউডেড উইথ ইকনমিক প্রবলেম' তখন অনেক সমস্যাই আসবে না। তা আমি একটা সাধারণ চরিত্র নিয়ে কী করব? আমি অবশ্য এত ভেবে ছবি করিনি, পরে আন্তোনিওনি পড়ে মনে হয়েছে— রাত্রি বারোটার পর কোনো সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত লোক বোধ হয় 'শ্রাউডেড উইথ ইকনমিক প্রবলেম' থাকে না। ওই যে বারোটার পর মদ খেয়ে কথা বলত লোকে, আমিও হয়ত অনেক কথা বলেছি, সেটাই ছিল আমাদের যথার্থ অস্তিত্ব, সেটাই আমাদের মানবিকতা।

ক্যামু যে রকম বলেছেন, মানুষ আর কী করতে পারে, নিজেকে ছড়াতে পারে—ফরাসি ভাষায় 'সে'তাদ' মানে নিজেকে প্রসারিত করা। এছাড়া অস্তিত্বের আর কোনো মানে নেই। আপনি নিজেকে ছড়াবেন, আপনি একা বাড়িতে বসে থাকতে পারেন না। 'নো ম্যান ইজ অ্যান আয়ল্যান্ড', কোথাও না কোথাও আপনি নিজেকে মেলে ধরবেনই।

৭. বস্তুত পপ আর্ট

ছবি দেখার জন্য দর্শককেও প্রস্তুত হতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে। যেমন অ-আ-ক-খ শিখতে হয়েছে, তবেই বই পড়তে পারছি, ভুলেই গেছি শিখতে কত কষ্ট হয়েছিল। ফাদায়েভ নামের একজন লেখক একবার পিকাসোর ছবি দেখে বলেছিলেন 'আমি বুঝতে পারছি না', পিকাসো বলেছিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার বোঝা সম্ভব নয়। তুমি তো লেখাপড়া শিখেছিলে—কতদিন ধরে অ-আ-ক-খ শিখেছ? পেন্টিং দেখা তো শেখনি। শিখতে হবে, তা না হলে তুমি পারবে না।' ফিল্ম দেখাও অভ্যাস করতে হবে, পরপর, ফিল্মের মিউজিক খানিকটা জানতে হবে। আজকালকার

ছেলেরা অবশ্য অনেক বেশি মিউজিক্যাল মাইন্ডেড হয়। টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদিতে তারা নানারকম জিনিস শুনছে। ছোটবেলায় আমরা এতটা সুযোগ পাইনি। একই সঙ্গে কালোয়াতি গান আর পপ-মিউজিকে রিঅ্যাক্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের কাছে সেটা খুব সহজেই সম্ভব। শুনে শুনে তাদের মনটা তৈরি হয়ে গেছে।

নানারকম শিক্ষাদীক্ষার পর ছবি নিয়ে আমরা যখন দর্শকের কাছে যাচ্ছি তখন সবসময় যথার্থভাবে গৃহীত হচ্ছি না। যেহেতু দর্শকের অভিজ্ঞতা অন্যরকম, বোঝবার শক্তি অন্যরকম। হাজার হাজার লোক যাত্রা দেখে, বক্স-অফিস-হিট ছবি যেমন 'মহাতীর্থ কালীঘাট', 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' ইত্যাদি দেখে। কিন্তু আমাদের ছবি দেখে না।

এই কারণেই, সত্যজিৎবাবু এত প্রাইজ পেলেও—কমার্শিয়াল ফাইনান্সাররা তাঁর কাছে যায় না। নানারকমভাবে এখান-ওখান থেকে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে। বুদ্ধদেব-বাবুও এমন জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করছেন যেগুলোকে 'পলিটিক্যাল প্যাট্রোনেজ' বলা যায়। তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ যেভাবে বাইরের ফিন্যান্স পান, এঁরা সেভাবে পান না। তবে একটা প্রবলেম থেকেই যায়। এখন যদি আমাকে কেউ ছবি করার জন্য পয়সাও দিত— আমার মনে হয় ছবিটা মার খেত। 'তেরো নদীর পারে' এক সপ্তাহ চলেছিল, না হয় পাঁচ সপ্তাহ চলত। একই কারণে ঋত্বিকবাবুও মার খেয়েছেন। শুনেছি 'মেঘে ঢাকা তারা' কোনোরকমে পয়সাটা কভার করেছিল। সেটা— যে যাই বলুক— আমার মনে হয় ঋত্বিকের অন্যান্য ছবির স্ট্যান্ডার্ডে অনেক নিম্নস্তরের ছবি। তার ওপর তাঁকে সুপ্রিয়াকে রাখতে হয়েছে— অনেক ফ্যাক্টর প্লে করেছিল।

আজ ভ্যান গগের যা অবস্থা, তাঁর জীবদ্দশায় তেমনটা ছিল না। ভাইয়ের সাহায্য ছাড়া আঁকতে পারতেন না, ভাই ওঁকে পয়সা দিয়েছে, বাঁচিয়ে রেখেছে। এই হচ্ছে মুশকিল। একটা টাইম-ল্যাগ থাকে। লোকের তখন বোঝবার ক্ষমতা হয়নি। পিকাসোর ভাগ্য ভাল যে তাঁর সময়ে গুর্নেনিকার মর্ম বোঝার লোকের অভাব হয়নি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ইওরোপের ওই অবস্থায় কেউ সমগ্র জিনিসটাকে ধরছে না। গুর্নেনিকায় ধরা পড়ল সেই সামগ্রিকতা।

চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে যেমন শুরুতেই বাণিজ্যিক সাফল্যটা মার খায়নি। ক্রিটিকরা প্রথমে ওঁর ইনটেলেকচুয়ালিটি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছবি করলেই বক্স-অফিস হত—যেখানেই যায় সেখানেই পয়সা পায়। পরে ইনটেলেকচুয়ালরা ভাবতে আরম্ভ করল। লেখালিখি হল। চার্লির মতো সাকসেসফুল ফিল্ম-মেকারকে দেখে আমার যেটা মনে হয় যে ফিল্মের ভিত্তিটাই হল পপ-আর্ট। এর গণ-আবেদন না থাকলে চলবে না। কারণ এত টাকা খরচ করে যদি রিটার্ন কিছুই না থাকে তাহলে কেন ছবি করা বলুন তো? আপনি যদি বাজারেই না বের হন, আপনার যদি দর্শকই না হয়, আপনি কেন ছবি করবেন? ছবি হবে—অনেক প্রিন্ট হবে—একসঙ্গে রিলিজ হবে—লোকে দেখবে—যেমন ইওরোপে

এখন গান গাইছে—লোকে দেখছে – একসঙ্গে বিশ-পঁচিশ হাজার লোক। একটা বিরাট বাজার। ধরা যাক বড় বাজার, এই বড় বাজারের সঙ্গে শুদ্ধতা ও সত্যের বিরোধ আছে কি নেই তা ক্রিটিকদের আলোচনার বিষয়। আর্টিস্টদের কথা সেটা হতে পারে না। তা ছাড়া, যাকে আমি শুদ্ধ বলছি তা সাবজেকটিভ, বিরোধটাও সেইজন্য সাবজেকটিভ। অবশ্য যে দর্শক 'শোলে' দেখে খুশি তার পক্ষে রুচিশীল ছবি দেখার কোনো কারণ নেই। আর দর্শক যদি তৈরি না হয়, তার দায়িত্বও আমি নিতে পারি না।

মাধ্যমটা আন্তর্জাতিক স্তরে একটা সঙ্কটে পড়েছে। অন্ধ গলি। আর কিছু করার নেই। তবে ফিল্ম এর ভবিষ্যত একটা হবে। আপনি ক্যাসেট নিয়ে বাড়িতে বসে দেখবেন। একা একা বসে। আমি যেমন ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ি। এরকম একটা বাজার হবে। ভিডিও কালচার গড়ে উঠবে। সেটাই ফিল্মের ভবিষ্যত। আর বাকিটা হল স্পেকটাকুলার। স্পেকটাকলস্—যেমন ধরুন সমুদ্র শুকিয়ে গেল—টি. ভি.-র মহাভারতে যা দেখানো হল। অথবা সার্কাসে যেমন দেখানো হয়। আপনি যদি নতুন ধরনের ছবির সঙ্গে পুরনো ছবি আলাদা করেন, তবে দেখবেন এই স্পেকটাকল্ টাই আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি নতুন ছবিতে। আর রয়েছে মাইথোলজিক্যাল টাইপ এর জিনিস। মডার্ন মাইথোলজি। জেমস বন্ড। একটা লোক যে যেকোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কিছুদিন আগে কাউবয় ছবিতে যা ছিল। ঐ র‍্যাগেড লাইফ এর মধ্যে একটা বন্দুক আর ঘোড়া থাকলেই সে সব করবে। মডার্ন মাইথোলজি, অ্যামেরিকান মাইথোলজি। □